তপোধীর ভট্টাচার্য

তিতাস-কথা ও অন্যান্য : পুনঃপাঠের প্রস্তাবনা

'তার জগৎ বেদনার জগৎ। এ জগতে হাসি নাই আমোদ নাই। আপনজন না থাকার ব্যথায় তার জগৎ পরিম্লান। আকাশে তারা আছে, কাননে ফুল আছে, মেঘে রঙ আছে। তিতাসের ঢেউয়ে সে রঙের খেলা আছে, সব কিছু নিয়াও এই রূপোন্মত্ত বহির্বিশ্ব তার মনের গ্লানিমার সঙ্গে একাকার। একটার পর একটা সাগরের ঢেউয়ের মত কি যেন তার সারা মনটা ডুবাইয়া চুবাইয়া দেয়। তখন সে চাহিয়া দেখে, কূল নাই, সীমা নাই, খালি জল আর জল। দুই তীরের বাঁধনে বাঁধা তিতাসের সাধ্য কি সে জল আগলায়। এ যেন বার দরিয়ার নোনা জল—ছোট তটিনীর সকল নৃত্যবিলাসকে তলাইয়া দিয়া জাগিয়া থাকে শুধু একটানা হাহাকার। অনন্ত ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চায় মনে মনে। দেখে এত বিশাল বিপুল সময়ের মহাস্রোতে সে বুঝি বা একখণ্ড দুর্বল কুটার মতই জাগিয়া চলিয়াছে।' [তিতাস একটি নদীর নাম, অদ্বৈত রচনা সমগ্র, পৃ.৫১৭]

কথক স্বর এখানে যে বিষাদসিন্ধুর অনুভবকে শৈলতীব্র করে তুলেছে, এই পরাপাঠের বিচ্ছুরণই কি আখ্যানের বয়ানকে ঈপ্সিত অন্বিষ্টে পৌঁছে দিয়েছে? এই হাহাকার কি কেবল ছিন্নমূল অনন্তের, স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণের নয়। জানি, কথাকার আপন সৃষ্টিতে নিমগ্ন থাকেন আবার উদাসীন নিরপেক্ষতাও তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকে। যেন ব্রহ্মের মতোই বাক্‌বিশ্বের রচয়িতাও তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকে। যেন ব্রহ্মের মতোই বাক্‌বিশ্বের রচয়িতাও 'তদেজাতি তন্নেজাতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে' [তিনি চলেন আবার চলেনও না; তিনি দূরে আবার নিকটেও।] 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর স্রষ্টা নিজে সেই প্রান্তিক মালো সমাজের একজন যে একই সঙ্গে সামূহিক অস্তিত্বের প্রতি দায়বন্ধ অথচ বন্ধনভীরু নির্লিপ্ত একক সত্তা। এই সত্তা আপন অনুভবে শুষে নেয় সমূহের আলো-অন্ধকার, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আকাঙ্ক্ষা-নৈরাশ্য, উদ্‌ভাসন-তিমিরায়ন। কিন্তু গোষ্ঠীজীবনের উদয়াস্ত যত চমৎকারভাবে পরিবেশিত হোক না কেন, সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে সময়-প্রতীকী তিতাসের 'একটানা হাহাকার'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'কাঁদো নদী কাঁদো'র আখ্যানে আস্তিত্বিক রিক্ততা যে রহস্যময় কান্নার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল, অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতিকল্প-সত্তা অনন্তও শোনে তিতাসের অনুরূপ আর্তনাদ। তবে দুটি প্রতিবেদনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য এখানেই যে ওয়ালীউল্লাহ স্বয়ং নদীর কান্নায় সম্পৃক্ত হননি। কিন্তু মালো সমাজের অন্যতম অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতার বহুমাত্রিক সৃজনশীল ভাষ্য প্রকাশ করার

প্রয়োজনে শুনেছেন তিতাসের হাহাকার। যে-জগৎ নিরুপায়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তার গোধূলিনিবিড় ছায়ায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সম্পর্ক আর ব্যক্তিজীবন জুড়ে ব্যাপ্ত হচ্ছে আততায়ী সময়ের রূঢ় অন্ধকার।

উপন্যাসের বাচন তো শুধুমাত্র বিবরণ দেওয়ার জন্য নয়; দ্যোতনাগর্ভ যদি না হয় তার উপস্থাপনা, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় তার আয়ু। পরবর্তী প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে আখ্যান কোনো বার্তা হয়ে আসে না। ১ জানুয়ারি, ২০১৪ যাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছে, কোন্ পুনঃপাঠ-লব্ধ নতুন আলোয় বয়ানের তাৎপর্য খুঁজব আজ। 'বিশাল বিপুল সময়ের মহাস্রোতে ... একমাত্র দুর্বল কুটার মত' ভেসে যেতে-যেতে সত্যিই কি হারিয়ে গেছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার অনন্য স্রষ্টা। সত্তা নিংড়ানো বেদনার গ্লানিমা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই কি কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন 'প্রত্যাখ্যাত অপর পরিসর' এর সংবেদনশীল প্রতিনিধি অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিতাস-পর্বের জীবন-কথা কি তার আপাত উদ্দেশ্যকে গৌণ করে দিয়ে ব্যাপকতর ও গভীরতর নান্দনিক বার্তা বয়ে আনেনি? অনন্তকথা কি অদ্বৈতকথারই সৃষ্টিশীল পুনর্নির্মাণ নয়! 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'; এই আপ্তবাক্য কি সর্বজনীন সত্য? ব্যক্তিগত হয়েও যা নৈর্ব্যক্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়েও যা অনস্বীকার্যভাবে ব্যক্তিগত—সেই জীবন-সত্য সমাজ-সত্য সময়-সত্য যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর শিল্পবিশ্ব বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথাবদ্ধ ধারণার বিনির্মাণ করাটা আবশ্যিক। নইলে অদ্বৈত রচনার শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুনঃপাঠ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে।

নিম্নবর্গীয় চেতনা ও উপনিবেশোত্তর চেতনা মণিকাঞ্চন সংযোগ সাম্প্রতিক পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের বহুমুখী অন্বিষ্টকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করেছে। বিনির্মাণপন্থার সাহায্য নিয়ে আখ্যানের বহুস্বর যখন আবিষ্কার করছি, বয়ানে সোচ্চার ও নিরুচ্চার অভিব্যক্তির অন্তর্বয়ন বিশ্লেষণ করে বুঝে নিচ্ছি ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সত্য কীভাবে যুগলবন্দি বিধৃত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মানে তিতাস একটি নদীর নাম : এই হলো সাধারণ পাঠকের ধারণা। কিন্তু গবেষকদের নিরন্তর চেষ্টায়, একদিকে অদ্বৈত রচনাসমগ্র এবং প্রকাশনা অন্যদিকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' সহ লেখকের চারটে ছোটোগল্প, কয়েকটি কবিতা, চব্বিশটি প্রবন্ধ ও আলোচনা এবং 'রাঙামাটি' ও 'শাদাহাওয়া' নামে দুটি ছোটো উপন্যাস, 'ভারতের চিঠি পার্ল বার্ককে' নামক গদ্যগ্রন্থ আর প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ভ্যানগখের জীবন অবলম্বনে ইরভিঙ্ স্টোন রচিত উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ' এর অনুবাদ 'জীবনতৃষা' প্রভৃতি রচনার সানুপুঙ্খ ভাষ্য-টীকাটিপ্পনি উৎসুক পাঠকের কাজকে অনেকখানি সহজ করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বড়ো আশ্চর্য এক সমাপতনের কথা লিখি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে সৃষ্টির আগুনে নিজেকে ইন্ধন করে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন। যক্ষ্মা রোগে তাঁর অকাল মৃত্যু যেন একটি প্রতীকী ঘটনা। মৃত্যুর কাছে যেন নিজের জীবনকে আহুতি দিয়েছিলেন অদ্বৈত। ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার দুই আলোকস্তম্ভ—শেলী ও কীটস্—অনুরূপভাবে যথাক্রমে মলিন সমাধি ও ক্ষয়রোগের কাছে অকালে নিজেদের সমিধ হিসেবে নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু যে সমাপতনের কথা ভাবছি, তাহল সাঁইত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোথাও কি সত্তার গভীরে অবসানের

অবিরাম পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন? আর, তাই এক অমোঘ ইঙ্গিতে নিয়েছিলেন এমন এক মহৎ প্রতিভার জীবনকথা অবলম্বনে রচিত উপন্যাসের বাংলা ভাষান্তর করার দায়িত্ব যাঁর আয়ু ছিল ঠিক সাঁইত্রিশ বছরের। এই প্রতিভাবান মানুষটি হচ্ছেন পোস্ট ইম্প্রেশনিজম চিত্রকলার কিংবদন্তিতুল্য অদ্বিতীয় স্রষ্টা ভ্যানগখ। ১৮৫৩ সালে তাঁর জন্ম ও ১৮৯০-এ অকাল মৃত্যু। কোনোও সন্দেহ নেই যে এধরনের সমাপতন খুব বিরল। সেই সঙ্গে অনুবাদ কর্মের নামকরণও দ্যোতনাগর্ভ 'জীবনতৃষা'।

যে-সমাপতনের কথা লিখছি এখানে, তা নিছক নির্জীব তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। যদিও ভুলছি না যে অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী ভ্যানগখ ও তিতাস কথার লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সৃজনী ভুবনের দুটি ভিন্ন মেরুতে ছিলেন, দু-জনেই সাঁইত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে দুটি ভিন্নধরনের অনিবার্য আত্মক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছেন। অনন্তের উপলব্ধিতে জীবনের যে দহনময় সত্য ধরা পড়েছে, ভ্যানগখও তেমনি আত্মদহনে নিজেকে ইন্ধন করে নিয়ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। অদ্বৈতের ক্ষেত্রে অবসান এসেছে ক্ষয়রোগের বেশে আর গখ গেছেন আত্মহননের পথে। তবু এও বহির্বৃত তথ্য মাত্র, অন্তর্বৃত সত্য হল বেদনার নিবিড়তম দর্পণে জীবনের শিল্পময় প্রতিফলন। গখের পৃথিবী-বিখ্যাত ছবি 'সূর্যমুখী' বা 'তারা ভরা রাত' যেমন শুধুমাত্র সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি নয়, সত্তার সার্বিক দহন-জ্বালারও প্রকাশ, তেমনি অদ্বৈতের তিতাস-কথা ও কাহিনির আড়ালে প্রতিকারহীন নিঃসঙ্গতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। ভ্যানগখের ছবির ভাষ্যকারেরা তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে লক্ষ করেছেন 'The over powering experience of solitude, a solitude born of his hyper-sensitive responses to the strangeness and contingency of life.' (Ingo F. Walpher and Rainer Inetzger, Vincent Van gogh, Taschen, Los Angeles, 2000, p.482) অদ্বৈতের প্রতিকল্প সত্তা অনন্তের চেতনাকে যে নিঃসঙ্গতাবোধ অধিকার করে রেখেছে, তার প্রকৃত উৎস তো জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতন সম্পর্কে তার স্রষ্টার অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। গখকে যেমন বাইরের মানুষেরা দুর্বোধ্য বলে মনে করত, ততখানি না হলেও চল্লিশের দশকের টালমাটাল কলকাতায় অদ্বৈতের মতো অনাগরিক মানুষও যেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কইতেই স্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আপাতত এই পর্যন্তই।

।। দুই ।।

এমিল জোলার একটি প্রখ্যাত মন্তব্য এরকম : 'A work of art is a corner of creation seen through a temperament' নিঃসন্দেহে এটা খুব জরুরি কথা। যেমন স্রষ্টার, তেমনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের গ্রহীতার প্রস্তুতি ও মানসিকতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিতাস-কথার লেখক-স্বর যখন গোষ্ঠীগত মহাবিপর্যয়ের মধ্যে নির্মম সময়ের নৃত্যছন্দ আবিষ্কার করে, তার মধ্যে দেখতে পাই আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অমোঘ পালাবদলেরই উচ্চারণ। একটু আগে যে সর্বস্ব-হারানো মানুষের ব্যক্তিগত দহন-যন্ত্রণার কথা লিখেচি তা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সময়কথার নিয়ামক নিশ্চিহ্নায়নের বার্তাবহ। তিতাস যেহেতু মালোদের জীবনধারা, তার শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যে ব্যক্তির এবং সমষ্টির সর্বনাশ জনিত ট্রাজিক কারুণ্যই ব্যক্ত হয়েছে।

লেখক-স্বরের আপাত ঔদাসীন্যের আড়ালে রয়েছে যে দুর্নিবার অবসানের কাছে অসহায় আত্ম সমর্পণের ব্যঞ্জনা, বয়ানে পাঠক তা-ই খুঁজে নেন। তিতাস কথা তাই শুধু মালোদের জীবন জীবিকার অন্তকথা নয় কিংবা নয় অনন্তের আড়ালে থাকা অদ্বৈতের নিয়তির কথাও; এ আসলে সময়ে-সমর্পিত সত্তার বেদনাসিন্ধু মন্থনের রূপকথা। তাই যেন তিতাস একদা 'শাহী মেজাজে' আর 'স্বপ্নের ছন্দে' বয়ে যেত এবং যার তীরে মালোপাড়ার সুখ-দুঃখে গাঁথা জীবনে ছিল 'কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস'—সেই তিতাস হয়ে উঠল মৃত্যুনদী। ফলে বর্মণের সমাপ্তিবিহীন উপসংহারের বিবরণ হয়ে উঠল চিহ্নায়িত অর্থাৎ বাচনের উদ্বৃত্ত থেকে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ব্রাত্যজনের অমোঘ ইতিহাসের সংকেত 'এখন সে মালোপাড়ায় কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তারই বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।' [রচনাসমগ্র : ৫৬]

এরপরে আর কথা থাকে না কোনো। বরং হ্যামলেটের বহুস্বরিক অন্তিম উচ্চারণ ব্যবহার করে লিখতে পারি— The rest is silence' [Act V: Scene-II, Line 343]। তবু ভাবা যেতে পারে, শূন্য শুধু শূন্য নয়। অদ্বৈত অনিবার্য রিক্ততাকেও মানুষের আবহমান জীবন-কথার অপরিহার্য অংশ বলেই ভেবেছেন এই নিরিখে তাঁর প্রতিকল্প-সত্তা অনন্তের নির্লিপ্তিও হয়ে ওঠে। সক্রিয় পর্যবেক্ষকের (Participant observer) শিল্পিত প্রতিরক্ষার কৌশল। তবু সব কিছুর মধ্যে শুনতে পাই যেন লেখক-কথক যুগ্ম-অস্তিত্বের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস। নদীর উপর সবরকমের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর নিদারুণ ক্ষয় ও অপচয়ের জন্যে দায়ী যখন সেই নদী—তা তো মৃত্যু-প্রতীকী। জীবনের ঐশ্বর্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে মরণের সংকেত এই কূটাভাস অনতিক্রম্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণের আপাত-সহজ আটপৌরে রচনারীতি ও কত আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় ইতিহাসের গভীর দর্শন এবং ব্যক্তিগত ও সামূহিক অস্তিত্বের দ্বিবাচনিকতাকে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে—শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুনঃপাঠে এই শিল্পিত সত্য বড়ো হয়ে ওঠে। ভিনসেন্ট ভ্যানগখের জীবন-তৃষ্ণা অদ্বৈত মল্লবর্মণকে 'Lust for Life' এর বাংলা ভাষান্তর করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল কেননা নিজেকে ইন্ধন করেই শিল্পের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়, এই অনুভব তাঁর ছিল। তাঁর এই উদ্যম আজকের পড়ুয়ার কাছে সমাপতন কেননা যাঁর জীবনকথা প্রাণিত করছে অন্য দেশ-কালের সাহিত্য স্রষ্টাকে—দু'জনেই ঠিক সাঁইত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে নিজেদের শিল্পভুবনে স্থায়ী অভিজ্ঞান মুদ্রিত করে গেছেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে অদ্বৈত মল্লবর্মণ গোকর্ণঘাট থেকে যে-চিঠি লিখেছেন (২৩ জুন, ১৯৩৪), তাতেই দেখছি প্রগাঢ় সাহিত্যবোধ থেকে তিনি জানাচ্ছেন—'সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকে না। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে।' তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই এ-কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। আগুন ছাই-ঢাকা থাকেনি; তাঁর নীরব সাধনার মধ্যে যে প্রতিভা মুকুলিত হয়েছিল, তা সুধীজন সমাজে আদৃত নয় কেবল—পুনঃপঠিত হচ্ছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বর্গের মধ্যে সীমিত বাংলা সাহিত্যে ব্রাত্যজনদের অপর পরিসরের কথা

তাঁর মতো এত সার্থকভাবে আর ক'জনই বা প্রকাশ করেছেন। যে-নীরবতা দিয়ে গড়া অদ্বৈতের সৃজনী সংবিদ, তা-ই তো সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর প্রতিকল্পসত্তা অনন্তের উপস্থাপনায়। নীরবতার সাধনা যে আসলে প্রগাঢ় জীবনতৃষ্ণার বিশিষ্ট প্রকাশ, তা আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না। ভ্যানগখ-এর অনন্যতাও তাঁর সমকালীন মানুষদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তবু তাঁর ছাইচাপা আগুন আবিষ্কৃত ও বন্দিত হয়েছে। যে-কথা গখ সম্পর্কে অউরিয়ের লিখেছিলেন (২০ : ৬৯৮), আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিসরে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কে তা অনেকখানি প্রযোজ্য। 'a man must come a Messiah, a sower of truth to rejuvenate our geriatric art, indeed perhaps the whole of our geriatric, feableminded industrial society.' পুঁজিবাদী সমাজের আরোহী পর্বের শুরুতেই অদ্বৈত তাঁর 'ম্যাগনাম ওপাস' লিখে গেছেন। পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে পশ্চাৎপর গ্রামীণ সমাজের শরিক হয়ে তিনি কেবল লক্ষ করেছেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তেবাসীদের অনিবার্য ক্ষয় পুরোনো পৃথিবীর ভেঙে চৌচির হওয়ার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী; কিন্তু নতুন পৃথিবীর কোথাও সূচনা হচ্ছে—এমন তাঁর চোখে পড়েনি। গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন, সংকীর্ণ স্বার্থে মগ্ন, অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের পাঁকে নিমজ্জিত মহানাগরিক কলকাতায় যাঁর বেঁচে থাকার লড়াই চলছিল—সেই অদ্বৈত তাই নতুন শুরুর কথকতা করতে পারেননি। কেননা তা হত মিথ্যাচার।

তবে যে-কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখার মতো, তা হলো, সার্থক উপন্যাসে কাহিনি নির্মোক মাত্র; সময়ের স্রোতে ভাসমান গোষ্ঠী-জীবন যখন দুশ্চিকিৎস্য ক্ষয়ে আক্রান্ত, তাতে বিবর্তনশীল ইতিহাসের অনস্বীকার্য সত্যই নিষ্ঠুর নিরপেক্ষতায় ব্যক্ত হতে দেখি। পর্ব-পর্বান্তরে বদলে যায় জীবন—'এ তো বলার মতো কথা নয় কোনো। কিন্তু তাতে কত ব্যক্তি-পরিসর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কত সমাজ তার সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস সহ ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে—তাকে আখ্যানের অবলম্বন করতে পারেন শুধু অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো বিরল স্রষ্টা-ব্যক্তিত্ব। তিতাসের জলধারা শুকিয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত যে বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পন্ন, তার ইঙ্গিত কথাকার বারবার চিহ্নায়িত বাচনে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। আর, তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় লেখকের প্রতিকল্প সত্তা অনন্তের বিযুক্তিও। একটু একটু করে মালো-বসতিতে যে ক্ষয়ের সূচনা হয়েছে, তা লক্ষ করি আখ্যানের 'দুরঙা প্রজাপতি' শীর্ষক অংশে। সুবলার বউ-এর হেনস্থা প্রসঙ্গে মঙ্গলার বউ-এর জবানিতে বুঝে নিই, মালো সমাজের গোষ্ঠীগত ঐক্য শিথিল হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। বাজারের শিক্ষিত বামুন-কায়েতদের দোকান তেকে মালোরা জিনিস বাকি আনে। তাছাড়া 'জিয়লের ক্ষেপে যাইবার সময় তমসুক দিয়া তাদের নিকট হইতে টাকা আনে। বিয়া শাদিতেও টাকা ধার দেয় তারা। গ্রামের অধিক মালো তাদের বশ। তাদের কথা মালোরা কি গ্রাহ্য না করিয়া পারে! তারা যা বলিয়াছে মালোদের কাছে তা ব্রহ্মার লেখা।' (পৃ.৫৩৯) সুতরাং অর্থনৈতিক বাস্তবের কাছে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা মালো সমাজের চিরাগত গোষ্ঠী-চেতনায় চিড় ধরতে দেরি হলোনা। অন্যদিকে মালোদের নিজস্ব মাতব্বরেরাও দ্রুত পায়ের নীচে জমি হারিয়েছে। প্রতিটি ক্রিয়ারই যেহেতু অনুরূপ

প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, কৌম অর্থনীতি সংস্কৃতি-সমাজনীতি দ্রুত শিথিলতর—হতে শুরু করল। কিন্তু সত্য যেহেতু একবাচনিক নয়, গোষ্ঠী-জীবনের ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের মধ্যেই অনন্ত লেখাপড়ায় মন দেওয়াতে 'একটি নূতন জগৎ তাকে দ্বার খুলিয়া ডাকিয়া নিয়া গেল।' কৌম সমাজের নাপিতানি তার মনে জ্বালিয়ে দিল অনির্বাণ আগুন—'তোকে আরো শিখিতে হইবে, বিদ্বান হইতে হইবে। বামুন কায়েতের ছেলের মতো এলএ বিএ পাশ করিতে হইবে। এই তিনকোণা পৃথিবী, চন্দ্রসূর্য ভূমণ্ডল সব তোকে জানিতে হইবে।' (পৃ.৫৪৩)

।। তিন ।।

একদিকে যখন লেখকের প্রতিকল্পসত্তা অনন্তকে অজানা একটা রহস্যলোক নিরবধি হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, অন্যদিকে সেই সময় অপ্রতিরোধ্য গতিতে মালোদের গোষ্ঠী-জীবন ডুবে যাচ্ছিল ক্ষয়ের চোরাবালি। এই তো জীবনের নিয়ামক দ্বিবাচনিকতা যা অনূদিত হয়েছে আখ্যানের শিল্পভাষায়। তাই একদিকে যখন অনন্ত তার প্রার্থিত বস্তুর সন্ধানে পথে পা বাড়াল, ঠিক তার পরবর্তী বাক্যেই অদ্বৈত অমোঘ সত্য উচ্চারণ করলেন—'মালোদের একতায় যেদিন ভাঙন ধরিল, সেইদিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বজ্রের মতো দৃঢ়; পাড়াতে তারা ছিল আঁটোসাঁটো সামাজিকতার-সুদৃঢ় গাঁথুনির মধ্যে সংবদ্ধ। কেউ তাদের কিছু বলিতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতরে যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।' (৫৪৩-৫৪৪)। শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুনঃপাঠে আখ্যানের এই অংশকে মনে হয় বিষয়াতিযায়ী প্রতিবেদন। কেননা মালো সমাজের সময়-চিহ্নিত ক্রমিক ক্ষয়ের বিবরণ শুধুমাত্র তাদেরই অধঃপতনের প্রতিবেদন নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বিচিত্র সহাবস্থান করে যে পুঁজিবাদ অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে, তিতাস-কথায় দেখি যেন তারই সাংকেতিক প্রাক্‌কথন। বিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে ও একুশ শতকের শূন্য দশকে আমরা ক্রমাগত যে পুঁজিবাদী পণ্যায়নের আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহে বন্দি তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক - অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক - নৈতিক - মনস্তাত্ত্বিক মহাবিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছি, দ্রষ্টা চক্ষু সম্পন্ন কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ তারই বহুমাত্রিক পূর্বাভাস-সূচক চিহ্নায়িত বয়ান তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিতে প্রকাশ করে গেছেন। বিশ্বপুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক যুক্তি শৃঙ্খলা হিসাবে উদ্ভূত আধুনিকোত্তরবাদ প্রাগুক্ত সময় পর্বে যেভাবে ক্রমাগত মানুষের বিশ্বাস-অনুভূতি-পরম্পরার জগৎকে বিচূর্ণিত করার জন্যে শস্যের মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে গেছে ক্রমাগত, সেই সর্বগ্রাসী চক্রান্তের পরিণামেই নস্যাৎ হয়েছে ইতিহাস-পরম্পরা ভাবাদর্শ।

এই প্রক্রিয়া বীজাকারে উপস্থিত তিতাস-কথায়। যখন আত্মিক বিনাশের কৃষ্ণপক্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে, দেখা দেয় আত্মবিস্মৃতি আর স্বভাবের পথ থেকে বিচ্যুতি। কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য কীভাবে গ্রহণের ছায়ায় আবিল হয়ে পড়ে, অনাড়ম্বর ও আটপৌরে ভাষায় অদ্বৈত তা দেখিয়েছেন। আজকের পাঠককে কেবল বাক্যান্তবর্তী বাঙ্ময় শূন্যায়তন থেকে তাৎপর্য ছেঁকে নিতে হবে—'যাত্রাদলের যারা পাণ্ডা, তারা অর্থে ও বুদ্ধিতে মালোদের চেয়ে অনেক বড়। তারা অনেক শক্তি রাখে। কিন্তু একসঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া, অল্পে অল্পে প্রয়োগ করিতে

লাগিল।' (পৃ.৫৪৪) এরকমই তো হওয়ার নিয়ম। উন্নয়নের বার্তাবাহী অপশক্তি চিরকাল এভাবেই বিদূষণের বিষক্রিয়া দিয়ে একটু একটু করে আমাদের মেরুদণ্ড অবধি পাঠিয়ে দিয়েছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে উত্তরোত্তর উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে অন্তেবাসীদের মনে দখলদারি সম্পূর্ণ করেছে বিশ্বপুঁজিবাদ। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে পারি, কথাকার অদ্বৈত কেবল 'কালঃ পচতীতি' বার্তা ভেবে দার্শনিক বিষাদে বুঁদ হয়ে যাননি। নিপুণ বিশ্লেষকের মতো যুগপৎ ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন; 'মালোদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায়-পার্বণে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষাণুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্মগ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। .....যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।' (পৃ৫৪৫)

মালোদের কৌম সমাজের এই নিদারুণ ভাঙনকালকে যদি মোটামুটি ভাবে বিশ শতকের চারের দশক বলে শনাক্ত করি, তাতে এটা অন্তত স্পষ্ট যে ওই ভাঙনে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক উথাল-পাথালের বড়ো পরিসরে নাগরিক পরিমণ্ডল দূরবর্তী নক্ষত্রালোকের মতোই সুদূর ও অলীক। মালোদের ছোটো পরিসরে ছোটো ইতিহাসের উদয় ও অস্তে তীক্ষ্ণতা ও গভীরতার কোনোও অভাব ছিল না। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগতের ধ্বংস গাথাকে আপাতদৃষ্টিতে একবাচনিক বলে মনে হলেও সংবেদনশীল অদ্বৈতের রচনা-নৈপুণ্যে সম্বোধিত পাঠক সমাজ কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পেতে পারেন। মালোদের ক্ষেত্রে আত্মধ্বংসের বীজ যেমন লঘু বিনোদন-সর্বস্ব যাত্রা বপন করেছে, তেমনি পরবর্তী দশকগুলিতে বৃহত্তর জনসমাজে আত্মবিনাশের মারীবীজ হয়ে এসেছে পণ্যায়ন-নির্ভর অপসংস্কৃতি। ধাপে ধাপে বিশ্বপুঁজিবাদের বেপরোয়া বিকারকে সন্ত্রাসের চরিত্র দিয়েছে উপগ্রহ-প্রযুক্তিতে। মালোদের যেমন হয়েছিল, বৃহত্তর জনপরিসরেও তেমনি মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক ধ্বস্ত হয়েছে এবং সর্বত্র অবারিত হয়ে উঠেছে মুষলপর্বের ছায়া। এই উপলব্ধিতে আমাদের উত্তীর্ণ করে বলেই তিতাস-কথ্য নিছক তিতাস-পারের মালো সমাজের অন্তকথা হয়না; আমূল পরিবর্তিত নতুন সময়ের পুনঃপাঠেও পাঠকৃতির মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত সম্বোধ্যমানতায় আমরা সম্পৃক্ত হয়ে যাই।

ফলে 'তিতাস একটি নদীর নাম' হয়ে ওঠে বড়ো আশ্চর্য এক দ্বিবাচনিক দর্পণ যার মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি আমাদের নিরন্তর আত্মবিস্মরণ ও ক্রমিক অবক্ষয়। তফাত শুধু এইমাত্র যে মালোদের 'অনেকেই নিরাশ হইয়া কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল' আর আমরা নানাবিধ প্রতাপ-কেন্দ্রের ছড়িয়ে-দেওয়া মায়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে জাগতিক প্রতিপত্তি নামক

সোনার হরিণ ধরার নেশায় স্বেচ্ছায় কালের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছি। কালোবরণ ব্যাপারী তো কেবল মালোদের মধ্যে নয়, রয়েছে অনেক বেশি সংখ্যায় তথাকথিত শিষ্টজনদের মধ্যে। কিন্তু তিতাস নদীর বুকে যেমন চড়া জেগে উঠেছিল, তেমনি সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা নির্বাধ হয়ে ওঠায় অবক্ষয়ক্লিষ্ট বৃহত্তর জনসমাজে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে সত্তাগ্রাসী সূত্র ধরেই দুর্বার বেগে ধেয়ে এসেছে তাদের সার্বিক অধঃপতন। আত্মসত্তা হারিয়ে কী বিপর্যয় মালো সমাজে নেমে এসেছিল তা অদ্বৈত 'ভাসমান' শীর্ষক অংশে এভাবে বিধৃত করেছেন—'তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তাদের নিজস্ব একটা সামাজিক নীতির বন্ধন ছিল, সেইটিও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হইয়া আলগা হইয়া গেল। একসঙ্গে কোনও কাজ করিতেই তারা আর তেমন জোর পাইত না। সামান্য বিষয় নিয়া তারা পরস্পর ঝগড়া করিত। এমনকী, ঘাটে নৌকা ভিড়াইবার সময়, কে আগে ভিড়াইবে এই লইয়া মারামারি পর্যন্ত হইত। জাল ফেলিবার সময় কার আগে কে ফেলিবে এ নিয়া তীব্র প্রতিযোগিতা হইত। তারই পরিণতিতে তাদের প্রধান দুইটি দলের মধ্যে মাথা ফাটাফাটিও হইত। অথচ এর আগে এসব কোনও কালেই হইত না।' (পৃ.৫৪৯) এই বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হয় নাকি অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের প্রত্যক্ষ পরিণাম হিসেবে যে চরম আত্মসর্বস্বতা আমাদের সাম্প্রতিকের গোত্র লক্ষ্মণ—তারই পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি এখানে! আত্মবিস্মৃতির যে-পর্যায়ে মালো সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছিল অসাড়তা, শ্বাসরুদ্ধকারী পেষণ, পূর্বজদের প্রতি অশ্রদ্ধা, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার অভাব এমনকী নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্যমের প্রতিও অনীহা—এই সবই সাম্প্রতিক কালে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মালোরা যেমন করেছিল, আমরাও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আসল কথা এই যে জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন যে—দ্বিবাচনিকতার দর্শন সার্থক আখ্যানের আশ্রয়ভূমি, তার অভাবে কী কী ঘটতে পারে—তিতাস-কথায় সেই সত্য উপস্থাপিত হয়েছে।

।। চার ।।

অদ্বৈত যেন ধাপে ধাপে নব্য যদুবংশের বিষাদসিন্ধু রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি যেন মহাকালের মতোই নির্মম নিরপেক্ষতা নিয়ে আদিগন্ত ব্যাপ্ত ধ্বংসের বয়ান রচনা করেছেন কালের যাত্রার ধ্বনি যেন আমরা শুনতে পাই প্রতিবেদনের বিশেষ ধরনে—'ক্রমে মনুষ্যত্বের পর্যায় হইতে তারা অনেক নিচে নামিয়া গেল। এত নিচে নামিয়া গেল যে শত্রু নাকের ডগায় বসিয়া শত্রুতা করিয়া গেলেও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না। রোষ কষায়িত চক্ষু ভূমির উপর নিবদ্ধ রাখিয়া একদলা থুথু মাটিতে ফেলিয়া বলিত, দূর হ কাউয়া। দিনে দিনে তারা আরও নিচে তলাইয়া গেল।' (পৃ.৫৫০) চিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার ছাড়া যাদের অন্যকোনও আশ্রয় নেই, তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ সে অস্তিত্বের সম্পূর্ণ নিরাকরণ—তা বুঝতে দেরি হয় না। তিতাস-কথার অন্তিমপর্বের সূচনায় তাই লক্ষ করি —মালোরা 'কোথায় স্রোতের কী নড়চড় হইল পইপই করিয়া খোঁজে। খুঁজিতে খুঁজিতে সত্যিই দেখিল, হিসাবে মিলে না; কোথায় যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। তারা বহু পুরুষ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গে পরিচিত। তাদের দিনে রাতের সাথী বলিতে এই নদী। এই মনের অলিতে গলিতে তাদের অবাধ পথ চলা। এর নাড়ি

নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। কাজেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিয়াই বুঝিতে পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে। বুঝিতে পারে এর বুকের কাছেই কোথাও খুব বড় চর ভাসিতেছে।' (পৃ.৫৫২)

বাচনের এই ধরনই বুঝিয়ে দিচ্ছে, তা গভীরভাবে চিহ্নায়িত। তিতাসের বুকে চর ভেসে ওঠার তাৎপর্য যে বহুমাত্রিক ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি। এবং কথকথা সমাপ্তি বিন্দুতে পৌঁছে গেলেও কথা কিন্তু ফুরোল না। বরং পাওয়া গেল, আসন্নকালের নতুন সমাজ-সত্য সূচনার আভাস। ইতিহাস এমনই ভাবে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তার উদাসীন রথচক্রতলে কত স্বপ্ন কত প্রত্যাশা কত ভালোবাসা কত অর্জন কত সংঘাতকে পিষ্ট করে। অদ্বৈত তাই আখ্যানের সত্যকে ইতিহাসের দর্শনে রূপান্তরিত করে লিখলেন; 'এ জায়গা যতদিন জলে ছিল ডোবানো, ততদিনই ছিল মালোদের। যেই জল সরাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনি হইয়া গেল চাষাদের। এখানে তারা বীজ বুনিবে, ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিবে। তাদের এ দখল চিরকাল বর্তাইয়া রহিবে, কোনোদিন কেউ এ দখল হরণ করিয়া লইবে না। তাদের এ দখল যে বাস্তবের উপর; তা যে মাটির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। আর মালোদের দখল ছিল জলে; তরলতার নিরাবলম্ব নিরবয়বের মধ্যে। কোনোদিন সেটা বাস্তবের স্পর্শ খুঁজিয়া পাইল না। পাইল না শক্ত কোনো অবলম্বন। কঠিন কোন পা রাখিবার স্থান। তাই তারা ভাসমান। পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালায় বাড়ি ঘরের সঙ্গে মিতালি করুক, তারা বাষ্পের মত ভাসমান। যতই তারা পৃথিবীর বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকুক, ধরার মাটি তাহাদিগকে সর্বদা দুই হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে, ঠাঁই নাই, তোমার ঠাঁই নাই। যতদিন নদীতে থাকে জল, ততদিন তারা জলের উপরে ভাসে। জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।' (পৃ.৫৫৩)

ইতিহাসের এই প্রত্যাখ্যানের ভাষা কেবল মুমূর্ষু মালোদের প্রতি উচ্চারিত হয়নি; কূলহীন কাল-সমুদ্রে এমনইভাবে সম্মুখ-ঊর্মিকে উপকূলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পশ্চাতের ঢেউ। সভ্যতার অগ্রগতি মানে তো এই; সমাজের কোনো-কোনো অংশের বেঁচে থাকার অভ্যাস মুছে যাওয়ার বিনিময়ে বিশেষ কিছু বর্গের দাপট। এই নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় যে-বিষাদ জেগে ওঠে, তা ক্ষণিকের কেননা অচিরেই তো নতুন বাস্তবের উন্মোচন জনিত উল্লাসে সেদিকে কেউ মনোযোগী হবে না। চিরকাল এরকমই হয়ে এসেছে; পরাজিতের সত্তা নিংড়ানো আর্তি ডুবে গেছে বিজয়ীর দৃপ্ত ঔদ্ধত্যে। তাই মালো সমাজের সর্বাত্মক ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হলো তাদের অর্থনীতি-সংস্কৃতি-নৈতিকতা সহ যাবতীয় কৌম মূল্যবোধ। বহু প্রজন্মের বসতি উজাড় হয়ে গেল, গ্রাম বলে আর কিছু রইল না। বেঁচে থাকার জন্যে কে যে কোথায় পাড়ি দিল, তার কোনো হদিশ থাকল না। যারা মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তাদের কেউ হলো সম্পন্ন চাষির জনমজুর আর কেউ বা হলো ব্যবসায়ীদের মুটে। কয়েকজন নিল ভিক্ষাবৃত্তি এবং একে একে অনাহারে মৃত্যুর অপেক্ষা থেকে তৈরি করল 'প্রেতের মিছিল।' মালোদের এই অন্তিম জীবন্মৃত অবস্থার অসামান্য বিবরণ 'তিতাস-কথাকে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস-খচিত আখ্যান। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ট্র্যাজিক সংবেদনায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' অনবদ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনটি বাক্যে তৈরি এই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'যারা মরিয়া গিয়াছে তারা রক্ষা

পাইয়াছে। যারা বাঁচিয়া আছে তারা শুধু ভাবিতেছে আর কতদূর। তিতাসের দিক হইতে যেন উত্তর ভাসিয়া আসে, আর বেশি দূর নহে।' জীবন-দায়ী নদী যখন মৃত্যুনদীতে রূপান্তরিত হয়, তার একদা-দাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা মালোবসতির চিহ্ন লুপ্ত হয়ে জেগে ওঠে শ্মশান-ছবি। যে একদা স্বাধীনভাবে জাল ফেলত ও জাল তুলত, সে কিছুদিন করল পরের গোলামি; তারপর নিঃশব্দে মিশে গেল আদিগন্ত ব্যাপ্ত শ্মশানের অনুপুঙ্খ হয়ে—'কিছুদিন আগে যেখানে যেখানে ঘর ছিল তার অনেকই এখন খালি ভিটা। ঘাটে আগে সারি সারি নৌকা ছিল, এখন আর নাই। মাঝে মাঝে দুই-একটা কেবল বাঁধা রহিয়াছে। যেখানে তারা জাল ভাসাইত, এখন সেখানে গরু চরিতেছে। ঘরগুলি কোথায় লুকাইয়াছে, ভিটাগুলি নগ্ন। তার উপর বাঁশের খুঁটির গর্ত, ভাঙা উনানের গর্ত, শিলনোড়া রাখার সিঁড়ি, মাটির কলসী রাখার সিঁড়ি আধ-ভাঙ্গা পড়িয়া আছে, উঠোনে ঝরাপাতার রাশি, তুলসীমঞ্চ ভাঙ্গিয়া শতখান। প্রদীপ দেখাইবার কেউ নাই।' (পৃ.৫৫৭) এই চিহ্নায়িত ভাষাচিত্রের পরে আখ্যানকারের করণীয় কিছু থাকেনা আর। এমনকী দুই প্রজন্মের প্রধান কুশীলব কিশোর ও অনন্তের কথাও স্বতশ্চলভাবে দ্রুত আরোহী ও অবরোহী পর্ব সমাপ্ত করার পরে নতুন কথাকেন্দ্র গড়ে ওঠারও অবকাশ থাকেনা। অনন্তের মা—সুব্‌লার বউ কৌম সমাজের অন্য প্রতিনিধিদের তুলনায় একটু বেশি পরিসর পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু এই আখ্যানের ভরকেন্দ্র যে সামূহিক অস্তিত্বে, অদ্বৈত তা মনে রেখেছেন। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ-এর মতো অনন্য-সম্পৃক্ত আকরণের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পূরবী রাগের বিষাদ-নিবিড় মূর্ছনার বার্তাই কথাকার পাঠকের মনে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।

।। পাঁচ ।।

গবেষকদের আন্তরিক চেষ্টায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের আরও দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'রাঙামাটি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭১ বঙ্গাব্দে, 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার দশটি সংখ্যায়। উপন্যাসের প্রতিবেদনে যে যৌথ কৃষির উদ্যোগের কথা রয়েছে, তা কারও কারও মতে ১৯৪৩ সালের ১৯মে তারিখে পঞ্জীকৃত 'মডেল ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত। যেহেতু ১৯৪৫ সালে মে মাসের আগে এই কোম্পানি কাজ শুরু করেনি, এ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে রাঙামাটি নিশ্চয় ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে লেখা হয়েছিল এমনকী এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে—'রাঙামাটি ছিল মডেল ফার্মের পরিকল্পনাটির সাহিত্যিক রূপায়ণ।' কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে। প্রথম কথা হল, কোনও সমসাময়িক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রকল্প তৈরি হওয়া মাত্রই তা সাহিত্যে রূপায়িত হয়না। সুতরাং যত মহৎ কল্পনাই হোক, হয় বাস্তবে তার অনস্বীকার্য উপস্থিতি থাকতে হবে নয়তো তার এমন কোনও ভাবাদর্শজাত প্রেরণা থাকতে হবে যা সাহিত্যিক সচেতনভাবে অনুসরণ করবেন। আর, ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝির আগে যে-কোম্পানি কর্মারম্ভের সার্টিফিকেট পায়নি, তার কোনও প্রভাব লেখকের উপরে না থাকারই কথা। বরং 'রাঙামাটি'তে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত নেই এবং ১৯৩৮ সালের পরে সোভিয়েত রাশিয়ায় গৃহীত যৌথ কৃষি-উদ্যোগের খবর ভারতে এসেছে, এতে এই ধারণা করাই সঙ্গত যে মডেল ফার্মের সঙ্গে এই উপন্যাসের

কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বরং প্রতিবেদনের অন্তর্বৃত তথ্যানুষঙ্গ থেকে মনে হয় অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রেরণা পেয়েছেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিক কর্ম-প্রণালীতে (দ্রষ্টব্য পৃ.৫৮৭-৫৮৮)

মনোরমা-রেণুকা-নবকুমার-বিজনেশ-জ্ঞানদাস-হরগোবিন্দ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত তৈরির চেষ্টা দেখতে পাই উপন্যাসে, তা তিতাস-কথার স্রষ্টার পক্ষে খানিকটা বেমানান বলেই মনে হয়। এখানে যে ত্রিকোণ প্রেমের প্রথাসিদ্ধ আকরণটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে পাঠক বরং লক্ষ করুন কথাকারের ভাবাদর্শগত প্রেরণাভূমিকে। কেননা নাগরিক জীবনের পরিমণ্ডল এবং নাগরিকতায় আধারিত কুশীলবদের উপস্থাপনা থেকে মনে হয়, এসব অদ্বৈতের স্বক্ষেত্রে নয়। 'কলকাতার কায়দা-দুরস্ত সম্প্রদায়ের' কয়েকজন নারীপুরুষের একবাচনিক বিন্যাসের মধ্যে ডাক্তার নবকুমার ও বিত্তশালী তরুণী রেণুকার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা যথেষ্ট অবাস্তব। পরবর্তী পর্যায়ে যেভাবে কাহিনি এগিয়ে গেছে তাতে হুইটম্যানের কবিতা ও কালিদাসের ঋতুসংহারের উল্লেখ এবং শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ ও চরিত্রহীনের প্রসঙ্গ উপন্যাসের বয়ানকে ঋদ্ধ করেনি। প্রধান ও গৌণ কুশীলবদের উপস্থাপনাতেও বুঝতে পারি তিতাস-কথার অনন্য স্রষ্টা এ ধরনের পরিসরে মোটেই স্বস্তি পাননি। প্রেম-জীবন-সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের পরিণত প্রজ্ঞার প্রমাণ অন্তত এতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজের ফুলে যেমন মৃত্তিকাজাত ফুলের সুঘ্রাণ ও সৌন্দর্য থাকেনা, —'রাঙামাটি'র প্রধান কুশীলবদের মধ্যে তেমনি দেখি স্বভাবের বদলে যান্ত্রিক কৃত্রিমতা ও অগভীরতা।

কিন্তু 'রাঙামাটি'কে যদি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর বিপ্রতীপ অপর হিসেবে গ্রহণ করি, তবে হয়তো বা অদ্বৈত মল্লবর্মণের শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুনঃপাঠ তাৎপর্যবহ হয়ে উঠবে। অবশ্য রেণুকা ও নবকুমারের কৃত্রিম সম্পর্কের লঘুতা প্রকট হয়ে পড়ে যখন তারা টস্ করে নিজেদের সম্পর্ক পরখ করতে চায়। বরং পাঠক ভেবে নিতে পারেন যে রেণুকার মতো বিপ্রতীপ অপর চরিত্র নির্মাণ করে যেন উলটো দিক দিয়ে অনাগরিক জীবনের নারীসত্তাকেই শ্রেয় বলে বোঝাতে চেয়েছেন কথাকার। রেণুকার বাচনে ব্যবহৃত বক্তব্য আসলে অদ্বৈতের ইচ্ছাকৃত 'এঁদো পুকুরের সবচেয়ে ভালো পদ্ম সেও পদ্মরাণী কিন্তু সে যথার্থ রাণী কী না তার পরিচয় হয় তখনই যখন তাকে সরোবরের পদ্মের সঙ্গে রেখে তুলনা করা হয়।' (পৃ.৬১১) বোঝার ভুল যে কত উৎকট হতে পারে, তা স্পষ্ট করার জন্যই যে এই সংলাপ তৈরি হয়েছে, তা যখন নবকুমারের ভাবনা-সূত্রে কথকস্বর জানায়— 'পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তীব্র সুরার মতোই মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ মোহ টুটুবার মতো শক্তি ক'জনেরই বা আছে? তার মনে পড়ছিল, শ্যামল শস্য শোভিত, বৃক্ষলতা আচ্ছাদিত, রাঙামাটির আনন্দচিত্রখানি। বাংলার প্রতিটি পল্লী যদি এই রাঙামাটির মতো হত। এমন আদর্শ গ্রামের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে রেণুকা মায়ামৃগের সন্ধানে এসেছে নগরের মরুভূমিতে। আজ দেশে দেশে কাতর কণ্ঠে ডাক শোনা যাচ্ছে, দেশে ফেরো, সব দেশে ফেরো। আর এই সময়ে রেণুকা এলো কী না নগরের জাঁকজমকের মাঝখানে। নগরে দেহ আছে, প্রাণ আছে, হৃদয় নেই। বাহির-সর্বস্ব নগর।

যন্ত্রদানবের করতলগত।' (পৃ.৬১১-৬১২)

'রাঙামাটি'র সমাপ্তিকে ঠিক উপন্যাসের সার্থক উপসংহার ভাবা যায় না। অদ্বৈত সময় ও সুযোগ থাকলে বয়ানে আরও পরিমার্জন ও সংযোজন করতেন কিনা এই জল্পনা নিষ্প্রয়োজন। বরং, একটু আগে যে কথা 'রাঙামাটি' গ্রামে হরগোবিন্দের ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'কৃষি দ্বারা সমষ্টির উন্নতি' (পৃ.৫৮৭) ঘটানোর প্রসঙ্গে লিখেছি, তাকে সামান্য প্রসারিত করা যেতে পারে। তিতাসপারের জীবনকথায় সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত অদ্বৈত মর্মান্তিক যন্ত্রণায় এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে বিপুল সময়ের মহাস্রোতে এক টুকরো দুর্বল কুটোর মতো ভাসমান তাঁর প্রতিকল্পসত্তা অনন্ত। তাই তো তার জগৎ বেদনার জগৎ যেখানে রূপোন্মত্ত বহির্বিশ্ব মনের গ্লানিমায় আচ্ছন্ন। সেই আখ্যানে ছিল উত্তরাগহীন নিমজ্জনের বৃত্তান্ত আর একটানা হাহাকার। একটি ভালোবাসায় নিবিড় জগৎ দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল অথচ নতুন জগতের জন্ম দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না একবাচনিক সময়ে। সংবেদনশীল মন নিয়ে অদ্বৈত নিশ্চয় নতুন পৃথিবী নির্মানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই 'রাঙামাটি'কে হরগোবিন্দকে তিনি কৃষিলক্ষ্মীর উপাসক হিসেবে উপস্থাপিত করলেন তিতাস-কথার শেষে মালোসমাজের প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে নদী হলো জলহীন এবং নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা চর গেল কৃষকদের দখলে। তাই কি কৃষিকাজে অন্তর্নিহিত প্রাচুর্যের প্রতি অভিনিবেশ দিতে চাইলেন অদ্বৈত?

।। ছয় ।।

বিবরণ সূত্রে জানা গেল, হরগোবিন্দ বিলেতে গিয়ে কৃষিবিদ্যায় মেতে উঠেছিলেন আর 'বিলাতে সুবিধা না হওয়ায় ছুটলেন রাশিয়া, রাশিয়া থেকে জাপান তারপর দেশে এসে লেগে পড়লেন চাষের কাজে। আমেরিকা হতে এল সার, নানারকম সবজি বীজ আর রাশিয়া যোগাল কৃষিপদ্ধতি। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের রুক্ষ মাটি হয়ে উঠল সজীব—কৃষকেরা প্রজারা দুহাত তুলে নবীন জমিদারকে আশীর্বাদ করল।' (পৃ.৫৮৭) যদিও অদ্বৈত মল্লবর্মণ ললিত ও হরগোবিন্দের মতো বাল্যবন্ধুদের কথায় বার্তায় 'বেলশেভিজিমের আইডিয়া'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, নিবিড় পাঠেই এই চিন্তায় যৌক্তিকতার অভাব প্রকট হয়ে পড়ে। অদ্বৈত সমাজতান্ত্রিক চেতনা সম্পর্কে অবহিত থাকলেও একই সুতোয় ইংল্যান্ড-রাশিয়া-জাপান-আমেরিকাকে গেঁথে নিয়েছেন বলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বয়ানে লেগেছে ইচ্ছাপূরণের ছোঁয়া। কেননা সমাজতান্ত্রিক সমবায়ীকরণের মূল নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত চাষ-আবাদের যৌথ ধরন ও কৃষিজীবীদের বোধোদয়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনও কৃষি-পদ্ধতি স্ট্যালিনের আমলের সোভিয়েত রাশিয়া জোগান দিতে পারত না। মূলত ভাববাদী দৃষ্টিকোণের অধিকারী ছিলেন বলেই অদ্বৈত কৃষি-সমবায়ীকরণের মূল ভিত্তিটি লক্ষ করেননি। তাঁর রচনায় হরগোবিন্দ ব্যক্তিগত উদ্যোগই অসাধ্য সাধন করেছেন; তাতে সামাজিক সমবায়ী অর্থনীতির কোনও ভূমিকা নেই। তাঁর বাল্যবন্ধু ললিতের মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে হরগোবিন্দের অসামান্য সাফল্যের একমাত্র কারণ তার প্রভূত অর্থ ও অসীম প্রতিপত্তি।

শরৎচন্দের 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশের যে-স্বপ্ন হরগোবিন্দ সত্য করে তুলেছেন, তাতে পল্লীর সমস্ত দলাদলি-হিংসা-দ্বেষ দূর করে তাতে সাম্য আনা হয়েছে। তাহলে কি

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধে কথিত ধনীর শ্রীবৃদ্ধিতেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। হরগোবিন্দের মতে অন্তরের সদিচ্ছাই বড়ো। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ 'হঠাৎ একদিন উল্কার মতো খসে পড়ল গাঁয়ের বুকে—এত উচ্চ হয়ে এল যে গ্রামবাসীরা তাকে বুঝেই উঠতে পারল না।' (পৃ.৫৮৮) হরকোবিলের এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও তত্ত্ব অনুযায়ী প্রজাদের উন্নতির সঙ্গে জমিদারের উন্নতির কোনও বিরোধ নেই। তাঁর আদর্শে সমস্ত দেশ উদ্বুদ্ধ হলেই সমস্ত বর্গের দেশবাসীর কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে, এই ভাবনা কতটুকু যথার্থ তা কিন্তু উপন্যাসে পরীক্ষিত হল না। শরৎচন্দ্রের 'পন্ডিতমশাই' উপন্যাসে দুই বাল্যবন্ধু কেশব ও বৃন্দাবনের আলাপচারিতার ছায়া হরগোবিন্দ ও ললিতের কথাবার্তায় খুব স্পষ্ট। কিন্তু অদ্বৈতের উপন্যাসে এই প্রেক্ষিতের কোনও তাৎপর্যই রইল না যেহেতু রেণুকা - নবকুমার - বিজনেশদের ব্যক্তি পরিসরে কাহিনি রুদ্ধ হয়ে গেল। তবু, যাই ঘটুক, অদ্বৈত যে মনে-মনে তিতাস-কথায় প্রতিফলিত ধ্বংসগোধূলির ছায়া থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিলেন, এই ইঙ্গিতের জন্যেই 'রাঙামাটি' লক্ষণীয়—তার শৈল্পিক সার্থকতা বা ব্যর্থতার জন্যে নয়।

।। সাত।।

'শাদা হাওয়া' নামে ছোটো আয়তনের উপন্যাসকল্প রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সোনার তরী ' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের (১৯৪৮) শারদ সংখ্যায়। সম্ভবত ১৯৪২-এর ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ছাপার আগে কোনো পরিমার্জন করার কথা অদ্বৈত ভাবেননি। হয়তো ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পরবর্তী নতুন বাস্তবে এই বয়ানের প্রতি তাঁর আর কোনো আগ্রহ ছিল না। ১৯৪১-এর ২২ জুনের পরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধের চরিত্র অর্জন করেছে, ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছে প্রবল আলোড়ন এবং ১৯৪২-এর ১৮ নভেম্বর রাশিয়ায় লালফৌজের কাছে নাৎসী বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছে। সমকালীন ইতিহাসের এই চরম অস্থিরতার পর্বে অদ্বৈত নিজস্ব প্রতিক্রিয়া 'শাদা হাওয়া'র প্রতিবেদনের মধ্যে ব্যক্ত করছিলেন। জাতীয় রাজনীতির অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে কীভাবে আন্তর্জাতিক আবহ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রাম প্রতিভাত হচ্ছিল—সেই ভাবনার জটিল বিন্যাস-প্রতিন্যাসকে অদ্বৈত বুঝতে চাইছিলেন। বিনয় বাগচী, গোবিন্দ শর্মা, টম, জিল—এই চারজন ওইসব ভাবনার সূত্রধার; তবে একজনও পূর্ণাবয়ব মানুষ হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত অদ্বৈতের তেমন কোনও অভিপ্রায়ও ছিল না। নইলে পরবর্তীকালে খসড়াটির পরিমার্জন তিনি নিশ্চয় করতেন।

কেউ কেউ ভেবেছেন 'শাদা হাওয়া' সাহসী, পরীক্ষামূলক, এমনকী 'প্রতীকধর্মী' রচনা। কিন্তু এই তিনটি বিশেষণের সমর্থন সত্যিই কি বয়ানে পাওয়া যায় আদৌ। অতিভাষ্য ছাড়া এই খসড়াতুল্য লক্ষ্যহীন রচনাকে 'বহুক্ষেত্রেই যুগাতিশায়ী' বলে ভাবা কঠিন। তাছাড়া বইটির পরিশ্রমী সম্পাদক স্বয়ং সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন, 'উপন্যাস হিসাবে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ একটি আদল অদ্বৈত দিতে চেয়েছেন কিনা সন্দেহ।' (পৃ.৭১৮) তবে তাঁর এই অনুমান ভেবে দেখার মতো; 'শাদা হাওয়ার মূল প্রতিপাদ্য পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত তৃতীয় বিশ্বের

দেশ-সমূহের জীবন সমস্যার স্বরূপটি তুলে ধরা। ...শাদা হাওয়ায় তিনি চার ভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে চান। ভাবাদর্শই এখানে প্রধান হয়েছে—কাহিনি কেবল যোজকের কাজ করেছে।' (তদেব) তবে এই মন্তব্য সত্ত্বেও একটু সংশয় থেকেই যায়। প্রথমত, 'কাহিনী'ই বা কোথায় সুতোয়-বাঁধা পুতুলের মতো আচরণে ও কথাবার্তায়? দ্বিতীয়ত, 'ভাবাদর্শ'টা কী যা 'প্রধান' ভূমিকা নিয়েছে? তৃতীয়ত, লেখক 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক্‌কে'-তে যেহেতু একই বক্তব্য পেশ করেছেন—উপন্যাসকল্প রচনার চেয়ে প্রবন্ধ লিখলেই তাঁর অভিপ্রায় লক্ষ্যভেদী হতে পারত।

অবশ্য এই সবই তর্কসাপেক্ষ। যেখানে অণুমাত্র দ্বিধা বা প্রতিপ্রশ্নের অবকাশ নেই—সেই তো অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্বক্ষেত্র। তিতাস-কথার দক্ষ কারিগর সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই বলেই শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুনঃপাঠে কেউ ভাববেন তাঁর প্রবন্ধ-আলোচনা নিয়ে কেউ বা 'জীবনতৃষা' নিয়ে কেউ হয়তো তাঁর কথাসাহিত্যের স্বল্পালোচিত নিদর্শনগুলি নিয়ে। 'জীবন থেকে যিনি নানা ধরনের তাৎপর্য নিংড়ে নিতে চেয়েছিলেন, কেন তাঁকে কালব্যাধির নিষ্ঠুর আক্রমণে স্বল্পায়ু হতে হয়—এই জিজ্ঞাসার কি মীমাংসা আছে কোনো? শিল্প মানে নিরন্তর পুনর্নবায়িত সম্বোধ্যমান্যতা। তাই অদ্বৈত মল্লবর্মণ বুন্ধ থাকেননি তিতাস-কথায়; ভেবেছেন যেমন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে তেমনই আন্তর্জাতিক মানব-পরিস্থিতি নিয়েও। মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল ছিল যাঁর, কথা আলোচনা করতে গিয়ে যে জীবন-পাঠের দিশা খুঁজতে ফিরে যাই তাঁর সৃষ্টিভুবনে—এক অন্তর্বর্তী সংকেত যেন ইঙ্গিত উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারব উত্তর-প্রজন্মকে।